অম্লান স্মৃতি

শ্যামাপ্রসাদ কুণ্ডু

সকলের চেয়ে যিনি বয়সে ছোট তিনি আগে চলে গেছেন। 'রূপদশী' গৌরকিশোর। শিবনারায়ণ রায় একবার আমাদের কাছে বলেছিলেন, ''গৌরকে আমি সামান্য লেখাপড়া শিখতে উৎসাহ দিয়েছি, বই দিয়ে, বইপত্রের সন্ধান দিয়ে। কিন্তু গৌর আমাকে জীবন শিখিয়েছে।'' গৌরদা সম্পর্কে এমন চমৎকার অসাধারণ মূল্যায়ন আর কিছু হতে পারে না। গৌরকিশোরের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কে আমি কিছু লিখতে পারি নি। যেমন পারিনি আমার মায়ের সম্পর্কে লিখতে। ব্যক্তিগত বিষাদের শব্দায়ন করা খুব কঠিন কাজ। 'হৃদয় খুঁড়িয়া কে আর বেদনা জাগাতে ভালোবাসে?'

শিবনারায়ণ রায় ও অম্লান দত্ত-র সঙ্গে আমাদের পরিচয় ও পরবর্ত্তী ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব গৌরকিশোরের হাত ধরে। শিবদার ভাষায়, 'ওরা গৌর-এর গুণমুগ্ধ।' অনেকদিন আগে থাকতেই জানি যে শিবনারায়ণ ও অম্লান -ও গৌরদার গুণমুগ্ধ ছিলেন। গৌরকিশোরের পরে শিবনারায়ণ এবং এই সেই অম্লান দত্ত-ও চলে গেলেন। 'শূন্য করে' দিয়ে গেলেন জীবনের প্রচুর 'ভাঁড়ার'। আত্মবিস্মৃত, কলহপ্রবণ বাঙালি শিক্ষিত সমাজ এদের কেমনভাবে মনে রাখবে বা বিস্মৃত হবে তার বিচারক অমোঘ কাল। বর্তমান নিবন্ধের পরিসরে অম্লান দত্ত সম্পর্কে কিছু কথা — যা কিনা একান্ত ব্যক্তিগত হওয়া সত্ত্বেও ঠিক ব্যক্তিগত নয়— বলার চেষ্টা করি। চুকরো টুকরো কিছু অবিনশ্বর স্মৃতি যা অনেকখানি সময়ের পরিধি জুড়ে ব্যাপ্ত সেগুলিকে সাজিয়ে একটা অম্লান স্মৃতি - কল্পচিত্র রচনা করা যায় কিনা তারই চেষ্টা।

অম্লান স্বল্পবাক, অবিচলিত ও স্থিতধী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। সমুদ্র যেখানে সব থেকে গভীর সেখানে সবচেয়ে কম ঢেউ ভাঙে। বাহ্যিক উচ্ছ্বাসের আগলভাঙা প্রকাশ তাঁর চরিত্রবিরোধী ছিল। এর অর্থ এই নয় যে তিনি একজন নীরস, গম্ভীর, গ্রন্থচর্বিত মানুষ ছিলেন। তার অন্তরের সততই প্রবাহিত ফল্গুধারার মত রোমান্টিকতা, স্নেহ ও প্রেমের অফুরান স্রোত ছিল। যারা অম্লানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন তারা সে খবর রাখেন। আমার কাছে তিনি ছিলেন সেই বিরল প্রজাতির মানুষ যাঁর ভাবনা, শব্দোচ্চারণ ও জীবনচর্যার মধ্যে একটি সুষম ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল। তিনি যখন বলতেন তাঁর ছাত্র ও বন্ধুরা প্রতিটি শব্দ এবং তার দ্যোতনা ও ব্যঞ্জনা কান পেতে শুনতেন; তাঁর লেখা থেকে একটি শব্দও বাদ দেওয়া যেত না; তাঁর জীবনচর্চা ও জীবনচর্যাও ছিল তেমনই— সুঠাম, স্বচ্ছন্দ ও বাহুল্য - বর্জিত — প্রায় সন্ন্যাসীর মত। শেষ জীবনে তিনি যে ক্রমেই গান্ধীজীকে আবিষ্কার করছিলেন, বুদ্ধ ও রবীন্দ্রনাথের হৃদয়বেত্তা স্পর্শ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন আমার কাছে তা মনে হয়েছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক উত্তরণ। বারবার তার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে প্রেম, ভালোবাসা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার অমোঘ শক্তির কথা। প্রখর যুক্তিনিষ্ঠার সঙ্গে সহৃদয় প্রেম ও ভালোবাসার অপরূপ মিশ্রণ তৈরী হয়েছে অম্লানের জীবন দর্শণে। এই কারণেই বুঝি আমাদের অজান্তেই তিনি জায়গা করে নেন আমাদের মনে ও অনুভবে, যুক্তিতে ও ভালোবাসার এক অপ্রতিম জ্ঞানতাপস রূপে।

সালটা ১৯৭৫, স্থান কলকাতার বিখ্যাত কফিহাউস। আমরা তিনবন্ধু রমা ঘোষ, সুশান্ত চ্যাটার্জী ও আমি গৌরদার সঙ্গে কফি হাউসে অপেক্ষা করছি অম্লান দত্ত-র সঙ্গে দেখা করার জন্য। দেশে তখন জরুরী অবস্থা জারি হয়েছে। প্রকাশ্য রাজনীতি নিষিদ্ধ, সেন্সর ছাড়া কোনো লেখা ছাপা যাবে না। অসংখ্য রাজনীতিক কর্মী ও নেতা এবং বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষ কারাগারে আবদ্ধ। আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়, আমি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। আমার বন্ধুরা বুদ্ধিমুক্তি ও চিন্তার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। গৌরকিশোর তার মত এক প্রতিবাদ ও বিরোধিতা চালিয়ে যাচ্ছেন জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে। অম্লান -কে এসবকিছু যেন বিচলিত মাত্র করছে না। অম্লান এলেন কিছুক্ষণ পর। কোনের একটি টেবিলে গিয়ে বসলেন। অম্লান সেদিন আমাদের বলেছিলেন, ''আমি মনে করি - না ভারতবর্ষে জরুরী অবস্থা মানানসই। এটা একটা সাময়িক বিচ্যুতিমাত্র। অন্যদের মত আমি বিচলিত বোধ করছি না। যতদিন অবস্থাটা থাকে— তোমাদের তো তেমন কিছু করার নেই, তাই এই সময়ে তোমরা তিনটে কাজ করতে পার।

এক ঃ নিজেরা লিখে নিজেরাই পড়।

দুই ঃ যারা বিয়ে করোনি তারা যদি বিয়ে করতে চাও এই সময়ে করে নিতে পারো। এবং তিনঃ দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিকতা— এসব অনেক বড় বড় ধারণা। এসবের মূল একক যে পরিবার — সেই পরিবারে খোঁজ নিয়ে দেখ বিচ্ছিন্নতা ও ভাঙন বাড়ছে। আশে পাশে ঘর ভাঙছে। যদি পারো তাহলে এই ভাঙন আটকাতে চেষ্টা কর।'' —এই কথাগুলি উচ্চারণ করার পর অম্লান আর এক মুহূর্তও বসেন নি। যেমন স্থির, মৃদু ও নিশ্চিত পদক্ষেপে অম্লান এসেছিলেন ঠিক তেমনভাবেই চলে গেলেন। অম্লানের শেষ যাত্রাও— এর ব্যতিক্রমী ছিল না। দীর্ঘ জীবন পরিক্রমণ শেষ করে ধীর, স্থির, নিশ্চিত পদক্ষেপে তাঁর জীবন নিষ্ক্রমণ মহিমময়। আবেগ - উচ্ছ্বাস বর্জিত নির্ভার, নিরালম্ব মানুষটি এভাবেই চলে গেলেন।

কফি হাউসে বসে সেদিন আমাদের অভিমান নয়, রাগ হয়েছিল তাঁর উপর। এ কেমন রসিকতা! জরুরী অবস্থার মত একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে আমরা তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি যেন বালখিল্যদের সঙ্গে খানিক তামাশা করে গেলেন। তখন বুঝিনি। বুদ্ধি ও মনন খানিক পরিপক্ক হবার পর বুঝেছি যে আমাদের চারপাশে পরিবারগুলির মধ্যে, ব্যক্তিক-সম্পর্কের মধ্যে কি মারাত্মক ভাঙন ধরেছে। ভাঙনের মানুষ নতুন সমাজ গড়ে তুলতে পারে না। অম্লানকে একথাটা পরে একবার সাহস করে বলেছিলাম। তিনি মৃদু হেসেছিলেন মাত্র।

একদিন নিরঞ্জন হালদারের সঙ্গে কলকাতার ৫৯ বি, চৌরাঙ্গী রোডে একটি সেমিনার শুনতে গিয়েছিলাম। বক্তা জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাপতিত্ব করবেন অম্লান দত্ত। সভায় উপস্থিত হয়ে জানা গেল যে ঐ দিন ২ টো নাগাদ তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়েছে। ধরে নেওয়া হল তিনি আসবেন না - কারণ শ্মশানে গেছেন। কিন্তু অম্লান তো আমাদের মত নন, সভা শুরু হবার পনের মিনিট আগে তিনি এসে হাজির হলেন সরাসরি শ্মশান থেকে। ব্যক্তিগত শোক দুঃখ তাঁকে কখনো কর্তব্য থেকে চ্যুত করতে পারেনি। শ্রীমদভগবতগীতায় বর্ণিত প্রাজ্ঞ মানুষরা বুঝি এমনই অম্লান হয়ে থাকেন।

আর একটা ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। আমার অগ্রজ বন্ধু নীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর সঙ্গে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম

সৃষ্টিসন্ধান

প্রখ্যাত বাগ্মী ও সুপণ্ডিত শ্রদ্ধেয় হোসেনুর রহমানের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বর্ধমানে একটি সভায় আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। বিনয় ভবনের অধ্যক্ষ মাননীয়া আরতি সেনের বাড়ীতে গিয়েছিলাম তাঁর কাছ থেকে হোসেনুর কোথায় উঠেছেন তা জানার জন্য। অম্লান তখন আরতিদির বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও আমাদের সঙ্গী হলেন। মোরাম বিছানো রাস্তা ধরে আমরা হেঁটে চলেছি। অম্লান জানতে চাইলেন, ''এখন গৌর কেমন আছে?'' গৌরকিশোর তখন বাক্‌শক্তিরহিত অবস্থায় আছেন। দ্বিতীয় বাইপাস সার্জারির পর তাঁর কথা বলার শক্তি চলে গেছে। এমন একজন প্রাণময় মানুষ শুধু একা বসে থাকেন আর তাঁর দুই মায়াবী চোখ বেয়ে মাঝে মাঝেই অশ্রুধারা নেমে আসে অঝোর ধারায়। কতকিছু বলার জন্য তার প্রাণ আকুল হয়ে উঠছে অথচ কথা বলার শক্তি নেই– এই দুঃসহ যন্ত্রণায় গৌরকিশোর তখন জীবন্মৃত। সব শুনে অম্লান বললেন, ''এটা গৌর -এর বাঁচা নয়। ওর আর এভাবে বেঁচে থাকা উচিৎ নয়।'' খুব নিষ্ঠুর শুনিয়েছিল সেদিন কথাটা। হোসেনুর প্রতিবাদ করেছিলেন, ''শীলাবৌদির জন্যও তো ওঁর বেঁচে থাকা দরকার।'' অম্লান বলেছিলেন, ''কথা ও লেখা ছাড়া গৌর -এর বেঁচে থাকাটা মৃত্যুর চেয়েও নিষ্ঠুর। ওর এখন মরে যাওয়াই ভাল। অম্লান ঠিকই বলেছিলেন। যিনি গৌরকে ভালোবেসেছিলেন আপন জনের মত — একমাত্র তিনিই পারেন এমন সহজ করে এক অমোঘ নির্মোহ সত্যকে নির্ভার করে বলতে।

অম্লান দত্তের পাণ্ডিত্য, মেধা, অধ্যয়ন ও সংস্কৃতির জগতে তাঁর অবদান নিয়ে অনেক যোগ্য লোকে লিখেছেন এবং লিখবেন। আমি তাঁকে চিনেছি চল্লিশ বছর ধরে, কখনও খুব কাছ থেকে, বেশিরভাগ সময়েই অনেক দূর থেকে। আমার অনুভবে, মননে এবং আবেগে তিনি যেমনভাবে করা পড়েছেন তারই সামান্য কিছু পরিচয় ভাবনাচিন্তার সুধী পাঠক পাঠিকাদের কাছে তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই এই ব্যক্তিগত নিবন্ধের অবতারণা। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল দেরাদূনে তাঁর সাহচর্যে দশটি দিনরাত কাটানোর। মানবেন্দ্রনাথ রায় শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এক আন্তর্জাতিক সেমিনার ছিল সেখানে। একটি জামা, একটি প্যান্ট, একটি লুঙি, ফতুয়া ও গামছা — এই ছিল তার দশদিনের পোশাক পরিচ্ছদ। আমার মত সাধারণ শ্রোতা থেকে শুরু করে বিদগ্ধ ইনটেলেকচ্যুয়াল পর্যন্ত সকলেই তাঁর উচ্চারিত প্রতিটি কথা কি গভীর মনোযোগে সহকারে শুনতেন আমি দশদিন ধরে তা দেখেছি। প্রকৃত গুণী মানুষের কোনোরকম আড়ম্বর লাগে না, সাইনবোর্ডের দরকার হয় না।

একটা সেমিনারের কথা উল্লেখ কর্‌রে' এই নিবন্ধের ইতি টানব। বর্ধমানের অরবিন্দ ভবনে সেমিনারটির উদ্যোক্তা ছিলেন আমাদের বন্ধুরা। সেখানে হোসেনুর ছিলেন, গৌরকিশোর ছিলেন। বাবরি মসজিদ - রাম জন্মভূমি নিয়ে অনিঃশেষ বিতর্ক চলছে সারা ভারত জুড়ে। অম্লান তখন স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় স্থির প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন, ''চারদিকে এত রক্তপাত ও হানাহানি দেখে মনে হতে পারে বুঝি বা হিংসা শান্তির থেকে শক্তি শালী। আমি তা মনে করি না। ভালোবাসা ও শান্তির শক্তি অনেক বেশী। তা যদি না হত তাহলে মানব সভ্যতার পত্তন, বিকাশ ও বিবর্ধন হত না।'' এমন সত্য উচ্চারণ মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও আস্থা থেকেই বেরিয়ে আসে। অম্লান দত্ত মানুষের শুভবোধ ও ভালোবাসার শক্তিতে আস্থাশীল ছিলেন। তাই তিনি বারে বারে মানুষের স্বকীয় শুভবোধের উদঘাটনের কথা বলতেন। মানুষের প্রতি তিনি কখনও আস্থা হারায়নি বলেই সমন্বয়ের কথা বলতেন।

অম্লান, শিবনারায়ণ, গৌরকিশোর — এই ত্রয়ীর মধ্যে এক আশ্চর্য বন্ধুত্ব ছিল। তিনরকম মানুষ ছিলেন এঁরা। শিবনারায়ণের আভিজাত্যবোধ, অম্লানের অনাড়ম্বর স্থিতধী ব্যক্তিত্ব এঁদের দুজনকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছিল। এরা মানুষের সম্ভ্রম অর্জন করেছিলেন। দুজনেই ছিলেন মূলত সমাজ শিক্ষক। গৌরকিশোর ছিলেন সকলের আপনজন। কাছের মানুষ — যেমন মায়ের মত। আমরা যারা এই বিরল প্রজাতির মানুষদের সান্নিধ্য লাভ করার সুযোগ পেয়েছিলাম, নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করি। আমাদের চিন্তা ও ভাবনার জগৎ এর অনেকখানি গড়ে দিয়েছেন। নির্ভয় হতে শিখিয়েছেন।

অম্লান - ভাবনা

[কথোপকথনের লেখ্যরূপ। পথিক বসুকৃত 'অম্লান দত্ত ঃ ব্যক্তিত্ব ও সমাজভাবনা গ্রন্থে প্রকাশিত। সংশোধিত পুনর্মুদ্রণ।]

আবেগ ও যুক্তি

প্রতিপ্রজন্মেই আবেগী কিছু ছেলেমেয়ে থাকে, চলে আসে। কেন আসে সেটার কথা তুললে মনে হয়, না আসাটাই তো অস্বাভাবিক। মানুষ মানুষকে ভালবাসবে বুঝতে চেষ্টা করবে, এটাই স্বাভাবিক। সেটা যে হয় না, তার কারণ হল, লোভ। আবার ওখানে একটা বিরাট রহস্য হয়েছে। ভোগী দেশের ছেলেমেয়েরা এখন বিরক্ত হয়ে উঠেছে, ভালবাসা তো কিনতে পারছে না অথচ সমৃদ্ধির চূড়ায় বসে রয়েছে। বহু ছেলেমেয়েকে দেখেছি, আমেরিকাতেই, কমিউনিটি গড়ে তুলছে, কিছু না হলে দল বেঁধে হরে কৃষ্ণ হরে রাম করছে। পার্থিব যা যা ভোগ করবার সবটাই তাদের নাগালে চলে এসেছে, এবার তাদের নতুন কী পাবার ইচ্ছে? প্রথম বিশ্ব দ্বিতীয় বিশ্ব বা তৃতীয় বিশ্ব এভাবে সব কিছু দেখি না —গান্ধী শিখেছে থোরো রাস্কিন টলস্টয় থেকে, আবার মার্টিন লুথার কিং নেলসন ম্যান্ডেলা গান্ধীর কাছ থেকে শিখেছেন— চিন্তার এই যাতায়াত সারা বিশ্ব জুড়ে হয়ে চলেছে। আমি যেখানেই থাকি না, মানুষের চিন্তা আমাকে স্পর্শ করবেই। সেটার বিশ্বের আবর্তের মধ্যে থেকে ঘটছে, প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয়, এভাবে নয়। তো সেই ভাবনা, নতুন কিছু করার আবেগ চিরকাল আছে, থাকবেও। আবেগী প্রাণেরা বিপদ জেনে ঝাঁপ দিয়েছে, দেবেও। যুক্তির ভূমিকা হল বুঝে নেয়া — যা আজ ছোট কিন্তু কাল বড় হতে পারার সম্ভাবনা রয়েছে তাকে যদি তোমার সঠিক মনে হয় তো যুক্তি দিয়ে বিবেচনা কর। কাজটা আজ ছোট হলেও কী কী পদক্ষেপ নিয়ে কাল তা ছড়িয়ে পড়বে, কিংবা, যে যে পথে চললে তাতে ভাঙন অবধারিত তাদের এড়িয়ে চলা— এটাই যুক্তি দিয়ে বুঝতে হবে। তেজ চাই, সংযম চাই।

[সাহস]

এমনটা নয় যে আমি সাহসী হবার চেষ্টা করেছি। ধাপে ধাপে সাহসী হয়ে উঠেছি, তাও নয়। দু'একটা ব্যাপার খুব ছোট বয়স থেকেই আমার মধ্যে হয়ে গেছে। আমি যুক্তি দিয়ে বলতেও পারব না কেন তা হয়েছে, তবে সেটা যে হয়েছে তা বলাই যায়, তাদের নিয়ে চলতে চলতে, তোমরা যাকে বলছ সাহসী হওয়া – তাই হয়ে গেছে। একটা ব্যাপার হল, আমি দেখেছি মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে, কিন্তু আমার কাছে মৃত্যু কখনও তেমন ভয়ের হয়ে ওঠেনি। কেন—তা আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না,

সৃষ্টিসন্ধান

হয়তো এটা মানসিক গঠনের ব্যাপারই হবে। আমি যে সাহসী তা নয়, আমি একদিক থেকে ভীতু, কয়েক ক্ষেত্রে তো মনে হয় যে অনেকের মনের জোর আমার থেকে অনেক বেশি। যেমন আমি অন্যের ব্যথা যন্ত্রণা সহ্য করতে পারি না, দৌড়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। একটা ঘটনা বলি— কলেজে তখন নিচু ক্লাসে পড়ি, পায়ে একটা অপারেশন হবে, কলকাতায় আমি একা থাকতাম, বাবা -মা ও -বাংলায় থাকতেন; তো একা একাই হাসপাতালে গেছি, চারিদিক দেখছি। অন্যেরা যন্ত্রণায় চিৎকার করছে এটা সহ্য করতে পারছিলাম না, আমি চাইছিলাম আমার অপারেশনটা আগে হয়ে যাক আমি বাড়ি চলে যাই। এখানে দেখ, আমার ওপর কি কাটাছেঁড়া হবে সেটার ভয় পাচ্ছি না অথচ অন্যের ব্যথা আমি সহ্য করতে পারছি না—আমি লিখেওছিলাম, ভাল সার্জন হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর কি বলা যাবে যে, আমি যথেষ্ট সাহসী? মৃত্যু হল যাবতীয় সুখ দুঃখের অবসান, তাই তাকে ভয় পাবার দুর্ভাবনা আমার আজও নেই। সাহসেই কথাটা ওঠে, যখন থেকে আমি স্বাধীন মত প্রকাশ করতে লাগলাম, সর্বোপরি তিনটে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সহ-উপাচার্য থাকার সময়ে কিছু ছেলে আমাকে শত্রু ঠাউরে 'মেরে ফেলব' 'পুড়িয়ে মারব' এমন হুংকার শুরু করল। সেখানে ঠিক সাহস নয়, মরার ভয়টা পেতাম না বলেই ও ধরণের পরিস্থিতিতে আমি ভয় পাইনি। অনেকবার ঘেরাও হয়েছি, অন্যকেউ ঘেরাও হয়েছে তারই মধ্যে ঢুকে পড়েছি, অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী সাবধানও করে দিতেন—একা একা ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, দুর্বৃত্ত ছাত্রেরা ওত পেতে বসে আছে, মারতে এলে কী করবেন—আমি এতে মজা পেতাম। আমার এমন একটা ভাবনাও কষা হয়ে গেছিল যে, যদি কেউ আমাকে খুন করতে আসে তা হলে তাকে বলব যে, ভাল ভাল বসো, একটু কথাবার্তা বলা যাক তোমার সঙ্গে, দেখো আমায় মারলে আমার তো কোনও ক্ষতিই নেই, কিন্তু তোমার যে ভাই বিপদ আসবে সেটা কী করলে সামাল দেবে। ধর, তোমার পেছনে পুলিশ লাগবে, তাকে ঠেকাবে কী করে, তারপর ধর তোমার তো মন আছে, আজ না হোক কাল কি পরশু মনের মধ্যে দুশ্চিন্তা আসবেই, একটা মানুষকে মেরে ফেলেছ এটা ভেবে কষ্ট হবে—তো দেখ, তোমার ভাল থাকার জন্যে কষ্ট কমাবার জন্য মরবার আগে আমি কী কী করে যেতে পারি... !

আসলে, যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারি মানুষ যন্ত্রণাকে ভয় পেতে পারে, কিন্তু মৃত্যুকে ভয় পাওয়াটা ঠিক বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। আমার কাছে এটা স্বাভাবিকভাবে আসে না। ক্যানসার হল, আরও কিছুদিন বাঁচার জন্যে যন্ত্রণা সহ্য করা—এটা আমার অস্বাভাবিকই লাগে, তুলনায় মৃত্যু সব দুঃখকষ্টের অবসান বলে ভালই।

আমার ধারণা, যতক্ষণ বেঁচে আছি সমাজের জন্য ভাবা ও কাজ করা দরকার। যখন তা পারব না তখন কোন অধিকারে সমাজের অন্ন ধ্বংস করব, যতক্ষণ বাঁচছি সমাজ থেকে নিচ্ছি, তো কেবলি নিয়ে যাব কিছু দিতে পারব না—এটা ভাবলেই খারাপ লাগে। আবার এও ঠিক আমি চাইলেই যে মারা যাব তাও নয়, যদি সেরকম অনায়াস মৃত্যুর পথ কেউ বলে দিতে পারেন তিনি আমার প্রকৃত বন্ধুর কাজই করবেন।

[ধর্মবিশ্বাস]

মূল ভাবনা হল মোক্ষ নিয়ে, আমি মুক্তির কথাই ভেবে এসেছি। মোক্ষ চিন্তায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনস্তিত্ব নিয়ে ভাববার কোনও প্রয়োজন পড়েনি। অনেক সময় অনেকে প্রশ্ন করছেন, আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন কি? প্রত্যুত্তরে তাদের কাছ থেকে জানতে ইচ্ছে হয়, ঈশ্বর বলতে আপনারা ঠিক কী বলতে চাইছেন সেটা বুঝিয়ে বলুন, তা হলে সেটা মানা না মানার কথা বলা যাবে। পাশ্চাত্যে ধর্মচিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে ঈশ্বর থাকেন, কিন্তু ভারতীয় ধর্মভাবনায়, অনেক সময়ই দেখা যায়, সেটা মুখ্য হয়ে ওঠেনি, মোক্ষই নানা নামে হয়েছে প্রধান প্রশ্ন। এটা বৌদ্ধ দর্শনে এসেছে জৈন দর্শনে এসেছে। পাশ্চাত্যে দ্যকার্তই অন্যভাবে ভাবা শুরু করেছিলেন, দ্যকার্তে জানতে চেয়েছিলেন নিশ্চিতভাবে কোন কথাটা ধরে নিতে পারি যে তা আছে—তিনি দেখেছিলেন, সন্দেহ আছে, চিন্তা আছে। অন্যদিকে, বুদ্ধ বলছেন, দুঃখ আছে, ওটাই প্রথম কথা। দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, কারণটি খোঁজা যায় এবং সর্বোপরি, পথ আছে।

এটা আমারও ভাবনা। আমি যে বুদ্ধ পড়ে এমন ধারণায় এসেছি তা কিন্তু নয়। সতেরো আঠারো বয়স বয়সে আমার মনে প্রশ্ন এসেছিল যে, আমাকে জানতে হবে জীবনে সত্যি মূল্যবান কী আছে। মূল্যবান তো অনেক কিছুই রয়েছে কিন্তু তাদের মূল্য অন্যের আশ্রেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সত্যি মূল্যবান তাই যা নিয়েই মূল্যবান যা অন্যের ওপর নির্ভর করে না। এটা কী—তাই হয়েছিল আমার ভাবনা, কারণ এটি না জানলে আমি তো বুঝতেই পারছিলাম না কী জন্যে আমার বেঁচে থাকা প্রয়োজন। আর এ প্রশ্নের উত্তর যে বই পড়ে পাব না তা বুঝে গিয়েছিলাম, এর উত্তর আমাকে পেতে হবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে, নিজস্ব অনুভব থেকে। বই পড়ে কিছু জানব কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে যা জানব তাতে জানাটা আরও গভীরে পৌঁছে যাবে, যাকে বলা হয় প্রত্যয় বাড়বে; এটা বই পড়ে আসে না। এটাই খুঁজছিলাম। ভাবছিলাম। ভাবতে ভাবতে মনে হল, ভালবাসার অভিজ্ঞতাই হচ্ছে মূল্যবান যার মূল্য কারও ওপর নির্ভর করে না। এই ভালবাসা একজন মানুষের প্রতি হতে পারে, সমাজের প্রতি হতে পারে। সূর্য রোজই ওঠে, কিন্তু এমন একটা সময় আসে এমন একটা পরিস্থিতি আসে যখন সূর্যোদয় অতি মধুর হয়ে ওঠে। ওই মধুরতা ওই সময়টার জন্যই ওই মুহূর্তের জন্যই। এবং ওই সময় ওই মুহূর্ত একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির ভিতর রয়েছে, তখন যা দেখছি সবাই সুন্দর হয়ে উঠছে যা শুনছি সবই সুন্দর হয়ে উঠছে। এরপর যা আসে তা হল, যা আমার জন্য অন্য - নিরপেক্ষভাবে মূল্যবান তা সকলের জন্য মূল্যবান। সমাজ সম্বন্ধে ওই ধারণাই পাই, যাতে সমাজে সবাই আনন্দে থাকবে সুখে থাকবে। আর এরই উলটোদিকে যে সমস্যাটা রয়েছে তা হল, কোন ভালবাসা মূল্যবান সেটি বিচার করা। বিচার করলে দেখতে পাই, যে ভালবাসা ঠিক তার বিপরীত ধর্মটা তৈরি করতে পারে না, অর্থাৎ কিনা ঈর্ষার জন্ম দিতে পারে না, সেটাই প্রকৃত মূল্যবান। আমার ধর্মবিশ্বাসের প্রশ্ন যদি ওঠে তা হলে বলব, ওই স্বকীয় মূল্যবান ভালবাসা খোঁজাটাই আমার ধর্ম এবং তার প্রতি আস্থাশীল থাকাটাই আমার বিশ্বাস।

সৃষ্টিসন্ধান